যে নামে ডাকেনি কেউ তাকে

আবদুল হাই শিকদার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

যে নামে ডাকেনি কেউ তাকে	১৩
কবির বাড়িতে লাল নিশান	২৩
কোলাহলের বাইরে	২৮
তৈয়েবা খাতুন সামনে এলেন	৩৩

সান্দ্রাংশ

সান্দ্রাংশ-০১ : জীবনপঞ্জি	৩৯
সান্দ্রাংশ-০২ : গ্রন্থপঞ্জি	৪৪
সান্দ্রাংশ-০৩ : মুখোমুখি ফররুখ আহমদ	৪৬
সান্দ্রাংশ-০৪ : ফররুখ আহমদ সংবর্ধনা	৫৫
সান্দ্রাংশ-০৫ : সংবাদপত্রের পাতায় : শেষ অভিবাদন	৬০
সান্দ্রাংশ-০৬ : নির্বাচিত কবিতা ও গান	৭৬

যে নামে ডাকেনি কেউ তাকে

এক

১৮১৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি সুবিধাভোগী, অনুগত, মধ্যবিত্ত শ্রেণি নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ যে উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষায়তনের জন্ম দিক না কেন, এই কলেজে চতুর্থ শিক্ষক হয়ে কাজে যোগ দেন হেনরি লুই ভিডিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। তারই নেতৃত্বে সংঘটিত হয় বহুল আলোচিত-সমালোচিত তথাকথিত বেঙ্গল রেনেসাঁ। ডিরোজিওর অনুসারীরা ইতিহাসে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত হয়ে আছে। যেভাবে যে নামেই ডাকা হোক, আদতে এটি ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু বা কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুদের নিজস্ব রেনেসাঁ। এর সাথে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও নিম্নবর্গীয় হিন্দু জনতার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এই রেনেসাঁর আশি বছর পরে জন্ম নেন কাজী নজরুল ইসলাম। সত্যিকার অর্থে তাঁর আবির্ভাবের ভেতর দিয়েই সূচনা হয় বাংলাদেশের মুসলমানদের নবজাগরণ, শোষিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষের রেনেসাঁ। যদিও এই ক্ষণটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় আরও কুড়ি বছর, কলকাতায়

নজরুল নাজিল হওয়া পর্যন্ত। এই যে নজরুলীয় রেনেসাঁ, এর সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি ফররুখ আহমদ। বেঙ্গল রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার যদি মাইকেল মধুসূদন দত্ত হন, তাহলে নজরুলীয় রেনেসাঁর সার্থক সৃষ্টি ফররুখ আহমদ।

দুই

কে আমার সাথে একমত হবেন আর কে হবেন না, তা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছি না। সকল বিবেচনা বা বিচারই ব্যক্তির অবলোকন, অবস্থান, পাঠ ও পর্যবেক্ষণের উপসংহারমাত্র। ভিন্নমত থাকতেই পারে। আর না থাকলে তো বেঁচেই গেলাম। আমি এবং আমার মতো অনেকেই মনে করেন, আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ ছয়জন কবির একজন হলেন ফররুখ আহমদ। তালিকাটা এ রকম—মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এবং ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)।

এই শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন ট্র্যাজেডির নায়কও বটে। এক্ষেত্রে তার নাম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মতো দুঃখপীড়িত কথাশিল্পীদের কাতারে। কোনো না কোনোভাবে এই মহান কবি ও কথকদের প্রত্যেকেই তাদের জীবনে সমাজ কর্তৃক নানাভাবে বেদনার্ত হয়েছেন। কখনো কখনো গ্রিক ট্র্যাজেডি, আবার কখনো

কখনো শেক্সপিরিয়ান ট্র্যাজেডি আমৃত্যু অনুসরণ করেছে তাদের। ফররুখের শেষ পরিণতি তো অনেকটা রোমানিয়ার জাতীয় কবি মিছাই অ্যাসিনেস্কুট (১৮৫০-১৮৮৯)-এর প্রস্থানের মতো। সক্রেটিসের মতো ফররুখকেও হজম করতে হয়েছে বঙ্গীয় হেমলক। আবু হানিফার মতো সহ্য করতে হয়েছে সরকারি নির্যাতন।

আবার ভ্লাডিমির মায়কোভস্কির (১৮৯৩-১৯৩০) মতো ফররুখ আহমদও একই সঙ্গে স্বপ্নরূপ ও স্বপ্নভঙ্গের কবি। রুশ বিপ্লবের প্রবল সমর্থক, মহামতি লেনিনের প্রিয় কবি, মায়কোভস্কি সর্বস্ব স্থাপন করে অংশ নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানে। চেয়েছিলেন সাম্যবাদ, শোষণমুক্ত জীবন, সম্পদের সুষম বণ্টন, রাজতন্ত্রের অবসান, বাক্ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু বিপ্লোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি দেখলেন রাজতন্ত্রের স্থানে মাথা উঁচু করছে কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্ববাদ। বাক্ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ভিন্ন মোড়কে নিয়ন্ত্রিত। সংগত কারণেই সেই ধারাস্রোতে গা ভাসাতে রাজি হননি মায়কোভস্কি। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা জুড়িয়েছেন 'A Cloud in Trousers', 'Talking with the Taxman About Poetry'-এর কবি। যার মৃত্যুর পর জোসেফ স্ট্যালিন বলেছিলেন—'The best and the most talented poet of our soviet epoch.'

ফররুখও ছিলেন স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের কবি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদার, নিষ্ঠুর মহাজন, কোলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণ

হিন্দু বাবু বুদ্ধিজীবীদের যাতনা থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে উদ্ধার করে একটা সম্মানিত জীবনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। এই স্বপ্নই ছিল তার 'পাকিস্তান'। পাকিস্তান তার কাছে ছিল একটা ইউটোপিয়া। সর্বপ্রাপ্তির দেশ। ফররুখের মতোই তার সময়ের সকল কবি—সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সানাইল হক, আহসান কবির, আবুল হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর আন্দোলিত হয়েছিলেন একই রকম স্বপ্নে। আমাদের পূর্বপুরুষ শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমানও দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন।

কিন্তু পোহাইলে মাধুয়া দেখা গেল, নাগরিক হিসেবে হয়তো কিছুটা সম্মান আমাদের বেড়েছে; কিন্তু শোষণ এসেছে ভিন্ন চেহারা নিয়ে। পাকিস্তানে শুরু হলো প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। আঘাত এলো ভাষার ওপর, স্বাধিকারের ওপর, গণতন্ত্রের ওপর। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের প্রহসন, ছয় দফা আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং সবশেষে ১৯৭১-এ আমাদের সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ—প্রতিটি ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক একটি মাইলফলক, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের এক একটি বিক্ষোভ, বিদ্রোহ। এই ক্ষোভ ও ক্রোধের মূল কারণ বহুল স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণায় পলে পলে তিলে তিলে দগ্ধীভূত হয়েছেন ফররুখও।

তিন

বাংলাদেশে নজরুল গবেষণার পথিকৃৎ এবং ফররুখচর্চার আদি পুরুষ কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)-এর কথার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি নজরুল ও ফররুখের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন—নজরুল মূলত জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার প্রাণ, আর ফররুখ হলেন ধর্মবাদী সমাজতান্ত্রিক। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নজরুল মিশ্র, ফররুখ আধমিশ্র। ফররুখকে বলতেই হয় :

আজকে ওমরপন্থী পথির দিকে দিকে প্রয়োজন,
কাঁধে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ।
ঊষর রাতের অনাবিল মাঠে ফলাবে ফসল যারা
দিক দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।

ধর্মবাদী সমাজতান্ত্রিক ফররুখের জন্ম ১০ জুন, ১৮১৮। অর্থাৎ, নজরুলের জন্মের ১৯ বছর পর তার ধরাধামে আগমন। পৃথিবী ত্যাগ করেন ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪। বেঁচেছিলেন ৫৬ বছর। সাহিত্য সাধনার বয়স ৩৪ বছর। *সাত সাগরের মাঝি*'র প্রকাশকাল ১৯৪৪। *আজাদ করো পাকিস্তান* ১৯৪৬, *সিরাজুম মুনিরা* ১৯৫২, *নৌফেল ও হাতেম* ১৯৫৮-৬১। জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় আরও ২০টি।

আমার কাছে মনে হয়েছে, ফররুখের আবির্ভাব যেন প্রকৃতির উপহার। প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না, নিজস্ব পদ্ধতিতে সে এগিয়ে আসে শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে। রবীন্দ্রনাথের

পরলোকগমন ১৯৪১ সালে। কাজী নজরুল ইসলাম নির্বাক হয়ে গেলেন ১৯৪২ সালে। এবার দেখুন, ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘সাত সাগরের মাঝি’ পত্রিকাস্থ হলো ১৯৪৩ সালে। আর তা গ্রন্থাকারে বেরুল ১৯৪৪ সালে।

এবার আমরা ফররুখে সময় বা কালটা দেখাব । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৮, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-১৯৪৫। দু-দুটি ভয়াবহ, বীভৎস ও সর্বনাশা যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে পৃথিবী। মানুষের সভ্যতা ধ্বংসের কিনারে। অন্যায়, অবিচার, অবিশ্বাস, অমানবিকতা, মৃত্যু, হানাহানি, নৈরাজ্য, নৈরাশ্যের বিকট আস্ফালন ও ধ্বংসাঙ্গের রক্ত হিম করা বিভীষিকায় ধসে গেছে প্রচলিত জীবনব্যবস্থা, মূল্যবোধ, আস্থা, মমতা। বিচলিত সমস্ত স্থিরকেন্দ্র। সেই ভয়ংকর সংকটে রবীন্দ্রনাথ যাপিত জীবনের পথচলা ও কান্না থেকে পিছিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আধ্যাত্মিকতায়। নজরুল কবিতা রেখে ডুবে গেছেন অবিনাশী সংগীতে। ত্রিশ দশকের কবিরা উপমহাদেশের পরাধীনতা, ক্ষুধা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ইউরোপীয় সাজার চেষ্টায় সেখান থেকে আমদানি করছেন ধূলি, বালু, ছাই, ভস্ম। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কবি এই গ্লানির জীবন থেকে উত্তরণের জন্য মার্কসবাদকে মেনেছেন মোক্ষ। ভেবেছেন, মার্কসবাদই করতে পারে সকল শোষণের মূলোৎপাটন। দীনেশ সেনের প্রিয় ছাত্র জসীম উদ্‌দীন এই সমস্যা ও নাগরিক কোলাহলে অস্থির হয়ে পড়লেন। বাংলা

কবিতাকে তিনি বললেন—অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরে চলো :

তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়;
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,

এই চিন্তা, দর্শন ও বাস্তবতার আলোকে ফররুখ আহমদ মানবরচিত সকল বাদ-মতবাদের ভাষায় আস্থা হারালেন। তিনি উপলব্ধি করলেন—মানুষ, মানবতা ও পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে বিশ্বাসের কাছে ফিরে যেতে হবে। মানুষের রচিত মতবাদ দিয়ে মানুষকে জুলুম-নির্যাতন থেকে উদ্ধার করে শান্তি ও কল্যাণের উপকূলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা তার ধারণা। তিনি ভিন্ন পথের সন্ধান করছিলেন। নতুন পথ অন্বেষণ করছিলেন। তার প্রত্যয় জন্মাল, এই পথটা হতে পারে ইসলাম। এগিয়ে যাওয়ার বার্তা ঘোষণা করে তিনি মানবতার মুক্তির মতবাদ হিসেবে ইসলামকে অবলম্বন করলেন। তিনি লিখলেন :

কাঁকর বিছানো পথ,
কত বাধা, কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্যদিনের পিশাচের হামাগুড়ি,
শকুনি ফেলছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি,

ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ...
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।

এখানে একটা কথা মনে রাখা জরুরি, ফররুখের ইসলাম কিন্তু মানুষের মুক্তির মহামূল্যবান আয়ুত্ব, যা শোষণমুক্ত সমাজ উপহার দেবে। কোনোমতেই প্রচলিত ধারণার সওয়াব অর্জন বা হুরপরি লাভের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফররুখের দৃষ্টিতে সেই মায়াকার পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো বিপদের নাম ছিল পরাধীনতা, শোষণ, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, কুসংস্কার। আর নির্যাতিতদের বেশির ভাগই ছিল বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের বাইরের মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দু। সংগত কারণেই তার লেখায় আধমিশ্রভাবে বারবার মুসলিমরা উঠে এসেছে। তখন যদি অন্য ধর্মের লোকও নির্যাতিত হতেন, ফররুখ হয়তো তাদের পাশেই দাঁড়াতেন। ইংরেজ ও বর্ণ হিন্দুদের দুঃশাসনে দীর্ঘ জীর্ণ মজলুম মুসলমানদের পাশে অভয় বাণী চিত্তরণের মধ্যে তাইতো অ-মহত্ত্ব দেখি না।

চার

মুসলমানদের মধ্যে কোনো রাজ নারায়ণ দত্ত ছিলেন না। তাই তারা কোনো মাইকেল পেলেন না। দ্বারাকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ না থাকার ফলে একজন রবীন্দ্রনাথও পাওয়া গেল না। রাজনীতিতে যদিও এতদিনে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী

স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হচ্ছেন; কিন্তু অন্য দিকগুলো ছিল অচাষকৃত। মাইকেল মধুসূদন যখন হোমার দান্তে বা মিল্টন হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে চলেছেন; রবীন্দ্রনাথ যখন গ্যাটে, শেলি, কিটসকে অতিক্রম করার পথ খুঁজছেন, সেই সময় আমাদের কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ মাইকেল হওয়ার চেষ্টা করছেন।

বাংলা কবিতায় অগৌরবের এই পরিবেশে ভোরের সূর্যের মহিমা নিয়ে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। এখন বলা যেতে পারে, ফররুখের প্রিয় কবি ছিলেন মাইকেল। কিন্তু তার চেতনালোকের বাতিঘর ছিলেন নজরুল। তবে এদের কারও পথেই তিনি পা মেলালেন না। তাকে আত্মবিশ্বাস জোগাল তার ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও জাগ্রত মন। জাতিকে জাগাতে গিয়ে যে ভাষা তিনি বেছে নিলেন, তা একেবারেই আলাদা। দেখুন :

তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে কাকরে দিনের জাফরান খোলে কলি
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশের স্বপ্ন সেহেলি জাগে গুলে বকাওলি?

বললেন :

ভেঙ্গে ফেলে আজ খাকের মমতা অকালে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালির বাঁধ,
ছিড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ!

তাঁর আহ্বানে নিজস্বতা :

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকটি হেরি;
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি!
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী!!
পাঞ্জেরি?

জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নয়, অন্তরের সাথে বদলাও পোশাকও। তিনি বলছেন—

কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিকনা সরে,
তবু দূরাচারী সফরের ঢেউ ভেসে এলো বন্দরে,
হাতির হওদা ওঠাও মাহুত কিংখাব কর শেষ;
আজ নিতে হবে জংগী সাঁজোয়া মাল্লার নীল বেশ।

পাঁচ

ফররুখের কবিতার রসদ সরবরাহ করেছে ইসলাম, ঐতিহ্য, আলিফ লায়লা ও পুথি সাহিত্য। মধ্যযুগকে তিনি প্রদান করেছেন নতুন মাত্রা। ঐতিহ্যকে করেছেন নতুনতর। ফররুখ আহমদের পিতা খান সাহেব হাতেম আলীও লেখালেখি করতেন। তার একটা আত্মজীবনীর কথা জানা যায়। জানা যায় *সেকান্দার শাহর ঘোড়া* গ্রন্থের কথা। দুজন পুলিশ অফিসারের কাছে বাংলা কবিতার বিশেষ ঋণ আছে। একজন ফররুখ আহমদের পিতা, অন্যজন কাজির শিমলায় নজরুলের সহায় কাজী রফিজ উল্লাহ। পুলিশ পিতার পুত্র ফররুখের মানস নায়ক, তার কাব্য প্রতিমা দুজন—একজন সিন্দাবাদ,

অন্যজন হাতেম তায়ী। হাতেম ফররুখের পিতার নামের নাম।

অনেকে বোকার মতো দুম করে বলে বসেন—ফররুখ কেন মুসলিম ধর্ম, পুথি, পুরাণ, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বেছে নিলেন? এইসব হাঁদা-গাধাদের জন্য অন্য পথে উত্তর—মাইকেল কেন রামায়ণ আর বৈষ্ণব পুরাণ বেছে নিলেন? রবীন্দ্রনাথ কেন উপনিষদকে প্রাণের অবমূল্যায়ন করলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের একজন নায়কও বাংলা ভাষাভাষী নন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র কেন *আনন্দমঠ* লিখলেন?

পালটা প্রশ্নের উত্তর দিক বা না দিক; এই মূর্খরা এদের বেলায় অকুণ্ঠ। কিন্তু নজরুল বা ফররুখের বেলায় কুণ্ঠিত। এর নাম হীনম্মন্যতা। কোন কবি, কোন লেখক কোত্থেকে কী নেবেন, তার প্রেসক্রিপশন কি এরা দেবে? ফুল তুমি ফোটো কেন? পাখি তুমি গাছে থাকো কেন? মনে রাখার জন্য উপকারী—কবি, শিল্পী, ফুল, পাখি আর্মিতে চাকরি করেন না। ফুঁ দিলেই দৌড় দেওয়ার ব্যাপার তাদের খাতায় নেই।

ফররুখ কেন বড়ো কবি—এ ধরনের কথা হামেশাই শুনি। কাকে বড়ো কবি বলা হয়, কাকে বড়ো কবি বলা হয় না, এ ধরনের জিজ্ঞাসার জবাবে তাহলে ভিন্ন উপস্থাপনার আয়োজন দরকার। আপাতত শুধু এটুকু জানিয়ে রাখা যায় যে, কবি ফররুখ আহমদের ছিল সুস্পষ্ট জীবনদর্শন। তার কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব, আছে

তীব্রতা। তার কবিতার হৃৎপিণ্ডে রয়েছে বাণীর সর্বজনীনতা, মানুষ এবং মানুষের মানচিত্র। তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ
হাতির দাঁতের সাঁজোয়া পড়েছে শিলাদৃঢ় আব্‌লুস
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

তখন কোষ্ঠকাঠিন্যাক্রান্ত পাঠককেও প্রাণ পাততেই হয় :

গোধুলি-তরল সেই হরিণের তণিমা পাটল
-অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোড়ে রাত্রির নিষাদ।

বাংলা কবিতার অনশ্বর সংযোজন :

হে জড় সভ্যতা
হে মৃত সভ্যতার দাস সঙ্গীত মেদ শোষক সমাজ
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ
তারপর আসিলে সময় বিশ্বময়
তোমার শৃংখলাগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে টানি।

ফররুখ আহমদের কবি মানস আপদমস্তক রোমান্টিক। তার আদর্শ, তার দর্শনের নাম ইসলাম। তার কবিতার ঢংটা ধ্রুপদ। তার কবিতার জগৎ রূপকথা, পুথি আর আলিফ লায়লার অনির্বাচনীয় পুলকে পুষ্পিত। এবং এ সকল কর্মের লক্ষ্য একটাই—‘মানবমুক্তি’।

ফররুখ হয়তো আলোচিত, হয়তো সমালোচিত, কিন্তু অনিবার্য। বাংলা কবিতা তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না, পারবে না। তিনি মরণের সঙ্গী হন না। শুধু পরমের সন্ধানেও পুরোটা নয়। কারণ, ফররুখ আসলে বস্তুবাদী, বাস্তববাদী। নেশার ঘোর লাগা চোখ তার নয়। তিনি নিকষ অন্ধকারেও জোয়ারের মতো জাগিয়ে রাখেন তার চেতনা। তিনি পথ দেখান, পথের সাথি হন :

সে থে যদিও পার হ'তে হবে মরু,
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠে পানি।
তবে পাল খোলো, তবে নোঙর তোলো;
এবার অনেক পথশেষে সন্ধানী
হেরার তোরণ মিলবে সম্মুখে জানি।

ছয়

ফররুখ আহমদ ইসলামপন্থি বলে, পাকিস্তানবাদী বলে সরিয়ে রাখার একটা প্রবণতা আধিপত্য পালিত কবি ও গবেষকদের মধ্যে আছে। এই কবি, গবেষক, অধ্যাপকরা কারা? এদের প্রতি সম্মান রেখেই এদের কুষ্ঠির সন্ধান নিতে বলব পাঠককে। তাহলেই এই সমস্ত ঝোপের ঝিপিত কিরকিটির থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

মার্কসবাদ, উপনিষদ নিয়ে কাজ করাকে যারা বাঁকা চোখে দেখে, তাদের আমি সঠিক মনে করি না। তেমনি

ইসলামবাদকে আদর্শ নিলে যাদের গা জ্বলে, তারাও সত্যিকার শিক্ষিত নন। এ ফ্যাৎনার জবাব আমি আগেই দিয়ে এসেছি। এখন শুধু এটুকুই যুক্ত করব—পাকিস্তান আমলে যারা সরকারি ঘি, মাখন, ননি, হালুয়া, কাবাব খেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন, ফররুখ আহমদ তাদের দলে ছিলেন না। আবার ৭১-এর পর যারা রাতারাতি ভোল পালটে 'পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ'-এর গন্ধ দূর করে 'জনগণ মন অধিনায়ক'-কে মাথায় তুলে অতি প্রগতিশীল সেজেছিলেন, ফররুখ তাদের দলেও ছিলেন না। ফররুখ ছিলেন তার নিজের মাটিতে, দুর্গন্ধমুক্ত জীবনে।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও লেখক কবিদের সম্পর্কে মরহুম আহমদ হুদা যা বলে গেছেন, তার পর আর কিছু বলার দরকার পড়ে না। আদর্শহীন, সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী এই শ্রেণিটি নিজের স্বার্থে যেভাবে যাকে বড়ো করার যায়, যেভাবে যাকে ছোটো করা দরকার, সেভাবেই নিজেদের পরিচালিত করে।

ক্ষুদ্রাকারে তিনটি ঘটনা ফররুখ আহমদকে বুঝতে সাহায্য করবে :

ক. পাকিস্তান সরকার একবার ঠিক করল, তারা পৃথিবীর দেশে দেশে পাকিস্তানের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কয়েকজন 'কালচারাল অ্যাম্বাসেডর' নিয়োগ করবেন। এই অ্যাম্বাসেডর দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে সংশ্লিষ্ট দেশের কবি, লেখক, শিল্পীদের সাথে পরিচিত হবেন। মতবিনিময় করে পাকিস্তানকে সম্মানের

জায়গায় নিয়ে যাবেন। এর জন্য তারা বিরাট অঙ্কের বেতন-ভাতাদি পাবেন।

প্রাথমিকভাবে পশ্চিম অংশ থেকে কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে কবি ফররুখ আহমদকে নির্বাচিত করা হলো। সারাজীবন বাম রাজনীতি করেও ফয়েজ এই প্রস্তাব লুফে নিলেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তার কথা, আইয়ুব খানের বাণী প্রচার করে, এই স্বৈরশাসকদের ইমেজ বৃদ্ধির কাজে কোনো কবি অংশ নিতে পারেন না/উচিত না। এটা জুলুমকে সহায়তা করা হবে।

খ. আইয়ুব খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) সমস্ত কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীকে পুরো পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরিয়ে দেখাবেন। ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচি, কোয়েটা, পেশেয়ারসহ বিভিন্ন শহর-জনপদে এই কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বেড়োবেন; সভা-সেমিনার করবেন। এজন্য ট্রেন ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়। নাম রাখা হয়—‘পাক জমহুরিয়ার ট্রেন ট্যুর’। সমস্ত খরচ সরকারের। এই ‘পাক জমহুরিয়া ট্রেন’-এর প্যাসেঞ্জার হওয়ার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক, সাংবাদিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। আজ যারা মহাসদস্য হয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা বাড়াচ্ছেন, তারা সবাই ছিলেন ওই সফরের সঙ্গী। শুধু ব্যতিক্রম ছিলেন একজন। তিনি

ফররুখ আহমদ। তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুবের এই কৃপা নেওয়াকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

গ. পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে পুরস্কার নিতেও তিনি বারবার অনিচ্ছা দেখিয়েছেন।

সাত

আমাদের সাহিত্যের এই অত্যন্ত গুরুত্ববাহী ও তাৎপর্যময় কবি থেকে দূরে থাকার অর্থ আসলে নিজের থেকেই দূরে থাকা। বাইরে উজ্জ্বল সূর্য, আপনি সে সূর্যের আলোতে চোখ মেলবেন না। এতে সূর্যের কী ক্ষতি? ক্ষতি তো হবে তার, যে দরোজা খুলে বাইরে এলো না।

ফররুখ আহমদের কাহিনিও অশেষ। আলিফের মতো খাড়া, অটল মানুষটি ছিলেন প্রেম ও প্রকৃতির রূপকার। সাহেবজাদীতে বলছেন :

রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ সাহেবজাদী
পাতার আড়ালে জাফরানা রং গোলাপের ফোটা দশ
সেতার বাজিছে কণ্ঠে তোমার বসারাত উজ্জ্বল
কখনো চটুল পুলকে হাসিয়া বেদনায় কভু কাঁদি
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ সাহেবজাদী।

রাত শেষ হয়ে যায়, তবুও ফোরায় না কাহিনি। অজস্র অসাধারণ সার্থক কাব্যকর্মের জনক ফররুখ তারপরও আফসোস করেন :

কিছু লেখা হল আর অলিখিত রয়ে গেল ঢের

কিছু বলা হল আর হয়নি অনেক কিছু বলা;
অনেক দিগন্তে আহত হয় নাই শুরু পথ চলা।

এ রচনা চয়নটি শেষ করার আগে শ্রদ্ধা জানাই কবি আবদুল কাদিরের স্মৃতির প্রতি। তিনিই এ দেশে ফররুখচর্চার সূত্রপাত করেন। ফররুখ আহমদ নিয়ে দ্বিতীয় নিবন্ধটির প্রণেতা দেওয়ান মোহাম্মদ আজয়াদ। ১৯৫২ সালে তার লেখাটি ছাপা হয়। ১৯৫৩ সালে ৩য় লেখার নির্মাতা কবি শামসুর রহমান। ১৯৫৪ সালে মরহুম মুজিবুর রহমান খাঁ সাহেব চতুর্থ রচনার জনক। আর ফররুখ আহমদকে নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের স্রষ্টা প্রফেসর ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম এবং অনবদ্য। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তার *কবি ফররুখ আহমদ*।